আমি কি - কে

দরশন আমার মূলধন
যুক্তি আমার শক্তি
প্রেম আমার ভিত্তি
মুর্শিদ স্মরণ আমার প্রাণশক্তি
বিশ্বাস আমার ধনভান্ডার
জ্ঞান আমার হাতিয়ার
ধৈর্য্য আমার অলংকার
আত্মমর্যাদা আমার অহংকার॥

সন্তুষ্টি আমার সম্পদ
সিদ্ধান্ত আমার লক্ষ্য
সত্য আমার প্রেরণা
বাধ্যতা আমার পথ
সালাত আমার আনন্দ
নিজের সাথে যুদ্ধ আমার নীতি
তাই হয়েছি আমি-আমি-আমি

হাক্কানী॥

হাক্কানী প্রার্থনা

হক্-ই সত্যি, হক্-ই মুক্তি
হক্-ই জীবন, হক্-ই শান্তি
হক্-এর সাথে নী নিয়ে
আমরা হলেম হাক্কানী ॥

হক্-ই ধর্ম, হক্-ই কর্ম
হক্-ই শক্তি, হক্-ই দীপ্তি
হক্-এর সাথে নী নিয়ে
আমরা হলেম হাক্কানী ॥

হক্-এ ভদ্র, হক্-এ নম্র
হক্-এ সাম্য, হক্-এ মৈত্রী
হক্-এ ভক্তি, হক্-এ ব্রহ্ম
হক্-এর সাথে নী নিয়ে
আমরা হলেম হাক্কানী ॥

হক্-ই ধারণ, হক্-এ চলন
হক্-ই চেতন, হক্-এ মরণ
হক্-এর সাথে নী নিয়ে
আমরা হলেম হাক্কানী ॥

বিধাতা --- বিধাতা --- বিধাতা ---
নত শীরে স্মরণ করি সবে
ভক্তি ভরে সঙ্গে রাখি
চলি জীবন পথে ॥

সূফী সাধক আবু আলী আক্তার উদ্দিন

তাঁর মূল্যবান বাণীর কয়েকটি

নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এঁর গুণে গুণান্বিত হও, তাহলে আল্লাহ্ পাবার পথ পাবে।
সে'ই ব্যক্তি স্বাধীন যে নিজের নফস্‌কে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত রাস্তায় বশে এনেছে।
যে ব্যক্তি সর্বদা তার আল্লাহ্‌র নিকট মার্জনা ভিক্ষা করে সে কখনো বিপদগ্রস্ত হয় না।
সকল কর্মের প্রারম্ভেই তুমি তোমার আল্লাহ্‌কে অবশ্যই স্মরণ করিও।
যে মুর্শিদকে দর্শন করতে সচেষ্ট হয়েছে তার হজ্বের যাত্রাও শুরু হয়েছে।
ইন্দ্রিয় সমূহের নিকট আগমনকারী সকল বিষয়বস্তু ও ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা ঘটিত সকল কর্ম সূক্ষ্মভাবে দর্শন করার মাধ্যমেই ঘটে আত্মদর্শন।
তোমার কর্মের মধ্যে প্রতারণা করিও না, প্রতারণা সব অপরাধকে বাড়িয়ে তোলে।
নিজেকে চেনার চেষ্টা কর। যতই নিজেকে চিনবে ততই আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হবে।
প্রত্যাশাহীন কর্মই ধার্মিক হতে সহায়তা করে ও আল্লাহ্ প্রাপ্তির সহায়ক হয়।
আত্মকর্ম বিশ্লেষণে ব্রত নিলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।
সত্য দেখার আগে সত্য নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করা শ্রেয়।
জ্ঞান অর্জনে বই-কেতাব হতে মানুষ-কেতাব উত্তম।
নিজের চোখকে আয়ত্তে আনো, সাধনার পথে এগিয়ে যাও।
তোমার আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, মুনাফিক আর মুশরিক না হওয়ার প্রচেষ্টায় রত থাক।
ঈমানদার সব সময় তার আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, দুঃখ শোকে ধৈর্য্যশীল।
তুমি প্রতিটি কর্মের মধ্যে সত্যকে অন্বেষণ কর তাহলে তোমার ইবাদতের দ্বার খুলে যাবে।
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল বিক্রম, পান্ডিত্য গর্ব দোষে খর্ব হয়।
ক্ষমা প্রদর্শন ভদ্রতার নিদর্শন।

কালোত্তীর্ণ এক মহাপ্রাণ আজো যিনি অম্লান

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে ছিল এক সংকটময় কাল। মুসলমানদের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী ভাবধারায় সমাজ গড়ে উঠতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ যারা পাশ্চাত্য ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। অপরদিকে একদল আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা চর্চা করে জীবিকা অর্জনের জন্য কোন সুবিধাজনক পথ না পেয়ে ইসলামের বিধান সমূহকে ব্যক্তি স্বার্থে পার্থিব উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। এই অবস্থায় সমাজের অবক্ষয় রোধ কল্পে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ডাক দিয়ে প্রকৃত পথের সন্ধান দেবার জন্য ও স্বার্থান্বেষী কথিত আলেম সম্প্রদায়ের মুখোশ সাধারণ মানুষের কাছে উন্মোচন করে ইসলামের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য একজন আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহা মানবের আবির্ভাব অতিশয় প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় ইসলামের উজ্জ্বল তারকা হিসেবে বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার ব্রহ্মপুত্র নদীর কিনারে ফরিদপুর নামক এক নির্জন বর্ধিষ্ণু গ্রামে আল্লাহ্‌র হুকুমে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে লোক সমাজে আল্লাহ্‌র দ্বীন বিশেষ করে তাসাউফ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন সূফী সাধক আক্তার উদ্দিন।

তাঁর জীবদ্দশায় তথ্য বহুল কোন লেখা প্রকাশিত না হওয়ায় বর্তমানে অনেক ভ্রান্ত তথ্য প্রচলিত রয়েছে। হাক্কানী মিশন বাংলাদেশের গবেষণা কেন্দ্র সূফী সাধক আক্তার উদ্দিন-এঁর আত্মীয়, আশেক ও ভক্তদের নিকট থেকে সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর জীবনী সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তার ভিত্তিতে এই প্রয়াস। এই লেখায় উত্থাপিত কোন তথ্য কারো কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হলে তা প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

সূফী সাধক আক্তার উদ্দিন (রঃ)-এঁর জন্মদিন পালন হয় বিভিন্ন দরবারে ২২/২৩ অগ্রহায়ণ। তবে যতদূর জানা যায় তিনি ২৩ অগ্রহায়ণ পৃথিবীর বুকে এসেছিলেন ফরিদপুর নামক গ্রামের সরকার বাড়িতে। তাঁর পিতা ছিলেন মরহুম মোজাফফর সরকার। তিনি একজন ধার্মিক ছিলেন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সূফী সাধক আক্তার উদ্দিন ছিলেন সবার বড়। তাঁর জন্ম সন নিয়ে মতভেদ আছে, তবে যতদূর তথ্য পাওয়া যায় ১৮৭২ সন হতে ১৮৮০ সনের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে অতিশয় আদর ও যত্নে লালিত-পালিত হয়েছেন। শৈশবে কুলিয়ারচর থানার ওসমানপুর নামক গ্রামে ওসমানপুর মক্তবে (বর্তমান প্রাইমারী স্কুল) প্রাইমারী শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তৎকালীন আসাম প্রদেশের (বর্তমান সিলেট জেলা) কোন এক মাদ্রাসায় কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাসা হতে জামাত উলা (স্বর্ণ পদকসহ) পাশ করেন। অতঃপর এনট্রান্সও পাশ করেন। এই সময়ে তিনি সাব রেজিষ্ট্রার পদে চাকরি পান। কিন্তু চাকরি ও দুনিয়াদারীর মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে না পারায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিভিন্ন দরবার ও আস্তানায় ঘুরে বেড়ান। তন্মধ্যে আজান গাছী (রঃ) ও শাহ্ সূফী আহসান উল্লাহ্‌র (রঃ) দরবার শরীফ উল্লেখযোগ্য। তিনি মিরপুর শাহ্ আলী বোগদাদী (রঃ)-এঁর মাজার শরীফে কিছুদিন কাটান তবে উল্লেখযোগ্য সময় কাটান শাহ্ আহসান উল্লাহ্ (রঃ)-এঁর দরবারে। এখানে তিনি ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। অতঃপর ১৮৯৫ সনের দিকে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও ভাবুক প্রকৃতির। গ্রামে তাঁর সমবয়সীদের সাথে বেশি মেলামেশা না করে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে আরম্ভ করেন। তাঁর পিতা সন্তানের এই অবস্থা দেখে নরসিংদী জেলার গকুলনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ভূঁইয়া বাড়িতে জনাব আলী ভূঁইয়ার মেয়ের সাথে বিবাহ দেন। বিবাহের পরবর্তীতে তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু শৈশবেই এক মেয়ে ও এক ছেলে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন এবং এক মেয়ে তাঁর ওফাতের এক থেকে দেড় বছর আগে বিদায় গ্রহণ করেন। সন্তান জন্মের পর সাধারণত মানুষ বেশি উৎসাহ নিয়ে সম্পদশালী হতে চেষ্টা করে কিন্তু এই সূফী সাধক ছিলেন ঠিক উল্টো। সাংসারিক জীবন তাঁর নিকট অর্থহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি গভীরভাবে এবাদত মুরাকাবা, মুশাহেদাতে মশগুল থাকাতেই বেশি সচেষ্ট থাকতেন। তাই বেশির ভাগ সময়ে তাঁকে একাকী অথবা কবরস্থানে

পাওয়া যেত। এই সময় নারায়ণপুর গ্রামে, প্রায় ৫/৬ বছর অবস্থান করেন। ঠিক এই অবস্থায় যখন তাঁর বয়স ৩৫-৩৮ বছর তখন তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়। তিনি হলেন মুক্ত। কোন কিছুই তাঁকে আকৃষ্ট করে দুনিয়াদারির মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখতে পারেনি। জ্ঞানের রাজত্বে বিচরণের জন্য ভাবের সাগরে ডুব দিয়েছেন তিনি। তৎকালীন লোভনীয় ও সম্মানীয় সরকারী চাকরি সাব রেজিষ্ট্রারের পদও তাঁকে আটকাতে পারেনি। আল্লাহ্‌র সন্ধানে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু সময় অবস্থান করেন। দুনিয়াদার মানুষকে কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট করাই সাধনার প্রথম স্তরে জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। তিনি কঠোর সাধনা ও রিয়াজতপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালী দ্বারা সমাজে আদর্শ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হযরত মাওলানা আজান গাছী (রঃ)-এঁর খেলাফত প্রাপ্ত হলেও শাহ্‌ সূফী আহসান উল্লাহ্‌ (রঃ) (মুগুরী খোলার শাহ্‌ সাহেব নামে খ্যাত) ও হযরত শাহ্‌ আলী বোগদাদী (রঃ)-এঁর সঙ্গে তাঁর এক গভীর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। নদীর কিনার ধরে হাঁটা, কবরস্থানে অবস্থান সর্বোপরি সারা রাত্রি দু'পায়ের উপর ভর করে বসে থাকা অবস্থায় নিজ খেয়ালে কুরআনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর সাধনা জীবনের অন্যতম দিক। শত শত মানুষ যখন তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটছে স্ব স্ব মকসুদ পূরণের আশায়, তখন তিনি নিজের মনেই হেঁটে চলেছেন। গড়ে প্রায় প্রতিদিন ২৬ থেকে ৩০ মাইল হাঁটতেন অথচ তাঁকে ক্লান্তি স্পর্শ করতে পারতো না।

গাছে ফুল ফুটলে তা যেখানেই হোক না কেন (শহর, গ্রাম, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি) মৌমাছি, মাছি আর ভ্রমর যেমন সেখানে যাবেই ফুলের স্বাদ গ্রহণ করতে, ঠিক তেমনি সূফী সাধকের আবির্ভাব ঘটলে সাধারণ মানুষ, ধর্মানুরাগী ও সমাজের অবহেলিত মানুষেরও জমায়েত সেখানে হবেই। সাধারণ মানুষ ছুটে যাবে তাদের দৈনন্দিন সমস্যার সুরাহার জন্য আর ধর্মানুরাগী যাবে আশ্রয়স্থল নির্ধারিত করার স্বপ্নে। অপরদিকে সমাজের অবহেলিত মানুষ যাবে সমাজের কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য। ঠিক একই ধারা চলতে থাকে কান্দুলিয়ায়। সূফী সাধক আক্তার উদ্দিনের কাছে জমায়েত হতে থাকে মানুষের বহর। এক আম গাছের নিচে কুঁড়ে ঘরে বাঁশের মাচার উপর তাঁর অবস্থান। দিনে-রাতে হাজার মানুষের আনাগোনা। ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর কামালিয়াত। খ্যাত হয়ে পড়েন 'কান্দুলিয়ার মৌলভী' নামে। এভাবেই চলে যায় দীর্ঘ ১২ বছর। যে যায় খালি হাতে ফিরে না। ত্যাগের আদর্শে চলতে থাকে ইসলাম প্রচার মানবতার কল্যাণে।

সূফী সাধক আক্তার উদ্দিন (রঃ)-এঁর সাধনার বয়সকাল ছিল প্রায় ৭৫ বছর। সাধনার এই জীবনকালে নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এঁর অনুসরণ করে তিনি তাঁর অনুসারীদের মাঝে সত্যের পথ ও ত্যাগের মাধ্যমে সত্যের পথ চলার বাস্তব দিকগুলো তুলে ধরেছিলেন। সৎ স্বভাব আর ত্যাগের মাধ্যমে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাঁর অনুসারীদের মাঝে, যাতে পরবর্তীতে তাঁরাও সমাজে একই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

ধর্ম মানবতার জন্য এ আদর্শ তাঁর কর্মে, চলাফেরা সব কিছুতেই প্রকাশ হয়ে ঝড়ের বেগে প্রবাহিত হতে লাগলো ষাটের দশকে। তাঁর চাঁদোয়ার নিচে এসে জমতে থাকলো মুক্তি পাগল কিছু যুবক যাঁরা আজও সাধনার জগতে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে। তন্মধ্যে শাহ্‌ আবদুর রহমান, সুলতানুল আউলিয়া আলহাজ্ব হযরত শাহ্‌ কলন্দর সূফী খাজা আনোয়ারুল হক্‌ রওশন জমির মাদ্দা জিল্লাহুল আলী অন্যতম। আরও আসলেন মাওলানা মুখলেসুর রহমান, সূফী হামিদুল হক সাহেব, সিরাজ সাহেব, পন্ডিত সাহেব, সোনা মিয়া, খালেক শাহ্‌, হানিফ শাহ্‌ ও আজিম উদ্দিন প্রমুখ। শাহ্‌ আবদুর রহমান সব সময় সূফী সাধক আক্তার উদ্দিনের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন। তার একটাই আর্জি ছিল সূফী সাধক আক্তার উদ্দিনের নিকট; তিনি যেন তাঁর মুর্শিদের আগেই ইন্তেকাল করেন। বাস্তবে সেটাই ঘটেছিল। চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন তিনি আগরপুর গ্রামে। সূফী সাধক আক্তার উদ্দিন প্রতিদিন ফরিদপুর গ্রাম থেকে হেঁটে সরারচর আসতেন এবং পোষ্ট অফিসের সামনে একটি কাঁঠাল গাছের নিচে বসতেন। চা খেতেন। পোষ্ট অফিসের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করতেন প্রতিদিন তারিখ ও সময় সম্বন্ধে। উপস্থিত জনসাধারণ, ভক্ত, আশেকানদের কথা শুনতেন; তারপর এক সময় উঠে রওনা দিতেন আবার ফরিদপুর গ্রাম অভিমুখে। সরারচর পোষ্ট অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে সুলতান সাহেব এবং পোষ্ট মাষ্টার তাঁর সান্নিধ্যে আসেন। সরারচরে যে স্থানে প্রতিদিন তিনি অবস্থান করতেন, আজ সেই জায়গা তাঁর আস্তানা শরীফ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো প্রচার করছে।

সূফী সাধকের সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধান খলিফা সূফী সাধক আনোয়ারুল হক্‌ তাঁরই নির্দেশে সাধারণ মানুষ ও ভক্তদের জন্য হাক্কানী ওজায়িফ, হাক্কানী তরীকা দেন দ্বীন-দুনিয়ার শান্তি ও মঙ্গল হাসিল করার জন্য। তাঁর আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসে তিনি মানবতার সেবায় হাক্কানী খানকা/দরবার শরীফ/আস্তানা শরীফ একের পর এক শহর/জেলা/গ্রামে উদ্বোধন করেন।

সূফী সাধক আক্তার উদ্দিন ১৯৮৪ সালে ওফাৎ করার ৩/4 বছর আগে যখন ফরিদপুর হতে সরারচর বাজার পর্যন্ত তিনি হাঁটতেন, তখন তা দেখে ভক্তরা মতামত করে একটা রিক্সা আনেন এবং তাঁর সমীপে আর্জি পেশ করেন রিক্সায় উঠে যাতায়াত করার জন্য। সূফী সাধক এই আর্জি গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রতিদিন তিনি রিক্সায় উঠে বসলে ভক্তরা রিক্সা টেনে টেনে নিয়ে যেতেন। বেশির ভাগ সময়ে পথিমধ্যে ডুমরাকান্দার বাজারে চা খেতেন এবং কিছু সময় ব্যয় করতেন এই বাজারের আশেপাশে।

সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যার আগে আগে যখন তাঁর ভক্তদের নিয়ে ফরিদপুর গ্রামে পৌছাতেন তখন আরম্ভ হতো আর এক দৃশ্য। সরকার বাড়িতে বৈঠকখানা ঘরটিই ছিল সূফী সাধকের দরবার হিসেবে। বারান্দায় তিনি বসতেন। টিনের ঘর। ভিতরে ছিল একটা চৌকি পাতা। কোন সময় বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে অথবা ভক্তদের মধ্যে থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন মনে করলে ঐ চৌকিতে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। অবশ্য এক সঙ্গে ৪ ঘন্টার বেশি কোনদিনই তিনি বিশ্রাম নেননি তাঁর সাধক জীবনে। এছাড়াও কোনো কোনো সময়ে বারান্দায় যেখানে তিনি বসতেন, সেখানে মাতৃগর্ভে শিশুরা যে অবস্থায় থাকে ঠিক একই ভাবে তিনিও ঐ বসার জায়গায় শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। তাঁর বসার জায়গায় বিছানো থাকতো কাঁথা, যা ছিল তাঁর আসন। বারান্দা ছিল উঠান হতে খুব বেশি হলে ছয় ইঞ্চি উঁচু। আসনের সামনের উঠানে দুটা ইট একত্রে রাখা থাকত। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে পৌছে তিনি ইটের উপর দাঁড়াতেন আর ভক্তরা তাঁর পায়ে পানি ঢালা আরম্ভ করতো। এই পানি ভক্ত ও মকসুদিরা হুড়াহুড়ি করে পান করত আর কেউবা গায়ে মাখত, যার যার নিয়ত করে এবং অপার মহিমা এই যে বেশির ভাগ লোকের সৎ নিয়তগুলো পূরণ হতো। তাই প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অনুধাবন করা খুব কঠিন যে, সূর্য অস্তের সময়ে এই দরবারে প্রতিদিন কী দৃশ্যের অবতারণা হতো।

অতঃপর পা ধুয়ে বারান্দায় তাঁর আসনে উঠার সময় ভক্তদের মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হতো কে কার গামছা দিয়ে পা-মুছিয়ে দেবেন। পা-মুছিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তাঁকে একটা শিশুর মত মনে হতো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন নির্বিকার। আসনে দু'পায়ের উপর উবু হয়ে বসতেন। তখন চতুর্দিকে আগরবাতি ও মোমবাতি জ্বালিয়ে পরিবেশটাকে ভাবগম্ভীর করে তুলতেন ভক্তরা। সবাই উঠানে বসে পড়ত। তখন আরম্ভ হতো তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনা। কার সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন একমাত্র তিনিই জানেন। তবে ভক্তদের মধ্যে যারা একনিষ্ঠভাবে শুনতেন, তারা অনেক জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন। যখন কোন ভক্ত বা মকসুদি কোন জিনিস তাঁর সামনে নজরানা হিসেবে দিতেন, তখনই দেখা মাত্র উপস্থিত সবার মধ্যে তা বিলি করে দিতেন। যদি কারো আনা খাবার পছন্দ হতো তাহলে অনেক সময় তিনি আঙ্গুলের সাহায্যে তিন/সাতবার তুলে গালে দিয়ে খেতেন এবং বাকিটা বিলি করে দিতেন। সারারাত্রি একইভাবে কাটাতেন। মাঝে মাঝে সারারাত্রির মধ্যে ১/২ কাপ চা খেতেন। ফজর পর্যন্ত চলতো এভাবে অতঃপর আবার হাঁটা শুরু হতো। প্রতি ওয়াক্তে আজান হতো। সবাইকে পাশের ঘরে উঠানে নামাজ পড়ার তাগিদ দিতেন। কিন্তু কেউ তাঁকে স্বশরীরে নামাজ পড়তে দেখেনি সাধনার জীবনে ১২ বৎসর কাল অতিবাহিত হওয়ার পর। তাই অনেক শরীয়তি মানুষের কাছে সন্দেহের দোলা দিয়ে ওঠে। তারা মেতে ওঠে সূফী সাধকের বিরুদ্ধে চক্রান্তে। তারা ফতোয়া দিতে আরম্ভ করলো, এমনকি 'কাফের' আখ্যা দিতে দ্বিধাবোধ করলো না সূফী সাধককে। কিন্তু তিনি নিশ্চুপ। তাঁর ইসলাম ধর্মের প্রতি আহ্বান এতে বাধাগ্রস্ত হলেও থেমে থাকেনি।

শরীয়ত সাধনার সাধক যে জ্ঞান লাভ করেন তা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিজাত জ্ঞান, গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ জ্ঞান আর মারিফত সাধনার সাধক যে জ্ঞান লাভ করেন তা হৃদয়জাত জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বা স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান। জ্ঞান লাভে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রয়োজন আছে কিন্তু স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান অধিক নিশ্চিত ও সঠিক। তাই মারিফতের এই জ্ঞানের উপর সাধক অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন যা লক্ষ্য করলে মনে হয় সাধক শরীয়ত উপেক্ষা করছেন। সূফী সাধক আক্তার উদ্দিন-এঁর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল ঠিক তাই।

তথাকথিত শরীয়তি আলেম সম্প্রদায় জনসাধারণের কাছে এমনকি তাঁর ভক্তদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লাগেন। এক শুক্রবার সূফী সাধক ফরিদপুরে তাঁর দরবারে বসে আছেন এমন সময় কতিপয় কুচক্রী আলেম দুপুর ১২টার দিকে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁর সাথে অবস্থান করতে থাকেন। জুম্মার নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা সূফী সাধককে প্রশ্ন করলেন - হুজুর আপনি নামাজ পড়লেন না। আমরা তো আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছি। তাহলে আপনি কি শরীয়ত মানেন না? হুজুর নিশ্চুপ। ভক্তদের মাঝে গুঞ্জন। দরবারে আনুমানিক ৩০০/৪০০ জন ভক্ত-মকসুদি ছিল। সবাই পরিস্থিতি দেখছে। এইভাবে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় কেটে গেল। দেখা গেল কিছু মুসুল্লি মসজিদে নামাজ পড়ে দরবারের দিকে আসছেন সঙ্গে ধামাতে ভাত ও তরকারি। তারা দরবারে এসে প্রথমেই সূফী সাধকের কাছে ক্ষমা চাইলেন দেরি হওয়ার জন্য। ভক্তদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? তাদের মধ্যে একজন বললেন - হুজুর আমাদের সাথে নামাজ আদায় করার পর হুকুম দিলেন - দরবারে মেহমান আছে কিছু খাবার আনলে - এই কথা বলে চলে আসেন। মেহমানদের জন্য আমাদের খাবার আনতে গিয়ে একটু বেশি দেরি হয়ে গেছে। কুচক্রী আলেমরা হতবাক। সূফী সাধক তাদেরকে খাওয়ায়ে বিদায় দিলেন। এমন জ্বলন্ত প্রমাণ পাবার পরও তাঁকে সরারচর যাওয়ার রাস্তায় বহুবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে।

'যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে তাহারা মৃত; বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না' (আল কুরআন - ২ঃ১৫৪)। 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর তাহা হইলে নিশ্চিত আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং রহমত উহা হইতে অনেক উত্তম যাহা তাহারা সঞ্চয় করিতেছে' (আল কুরআন-৩ঃ১৫৭)। এই পৃথিবীতে যে সমস্ত সাধক সত্য ও মানবতার জন্য নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করে তাঁদেরকে মৃত মনে করা উচিত নয়। কেননা তাঁরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে তাঁদের নিজেদের জীবনকে সমর্পণ করেন। তাই তাঁরা শারীরিকভাবে মারা গেলেও আধ্যাত্মিক-ভাবে চিরঞ্জীব থাকেন। দুনিয়ায় অধিষ্ঠিত মানুষ মোনাফেকগণ ধন-দৌলতকে প্রাণের মতই ভালবাসে এবং সেই কারণে মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করে অপর পক্ষে মুসলমান সাধকগণ আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা শুরু করে এমন এক অফুরন্ত ভান্ডারের অধিকারী হন যার সমকক্ষ কিছুই হতে পারে না। সেই রূপ অফুরন্ত ভান্ডারের অধিকারী সূফী সাধক আক্তার উদ্দিন কালোত্তীর্ণ এক মহাপ্রাণ। ❑

সূফী সাধক আনোয়ারুল হক্ এঁর মূল্যবান বাণীর কয়েকটি ঃ

- নিজের বিচার নিজে কর রাত্রি দিনে।
- সাবধান। হাসতে, খেলতে, দেখতে আর বলতে ঈমান চলে যেতে পারে।
- তুমি সেই ফুল হও - যে ফুল প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু ঝরে যায় না।
- যে ব্যক্তি মুর্শিদের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে না, সে দ্বীনের কাজ করতে পারে না।
- আল্লাহ্র স্বভাব মোতাবেক নিজের স্বভাব তৈরি করলে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ হবেই।
- মুর্শিদ দর্শনের মাঝে আত্মদর্শন। আর আত্মদর্শনের মাঝে আলাহ্ দর্শন।
- মনে রেখো - কেহ কোনো কাজে লেগে থাকলে মেগে খায় না।
- প্রশংসাকারী হও তাহলে প্রশংসিত হতে পারবে।
- মুর্শিদের প্রতি প্রেম, বিশ্বাস ও সমর্পণ যত অধিক হবে ততো তোমার অহংকার কমে যাবে।
- প্রত্যেক ব্যক্তিই তার স্বীয় কর্মের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে।
- এহ্সানের প্রতিদান এহ্সান ব্যতীত অন্য কিছু কি হইতে পারে?
- জ্ঞানী-গুণীজন কারো মন্দ গায় না - বিপথগামীও করে না, যারা বুঝে না তারা অজ্ঞ, শিক্ষিত হলে হবে কি।
- স্বীয় জিহবা শাসনে রাখো - পলকে পলকে মুর্শিদ দেখো।
- ভোগের আনন্দ সাময়িক - ত্যাগের আনন্দ চিরন্তন।
- বিপদে ধৈর্যশীল হও, অন্যের দোষ ক্ষমা করো - তাহলে তুমিও আলাহ্র দরবারে ক্ষমা পাওয়ার প্রার্থী হতে পারবে।
- মুর্শিদের হুকুম অনুসারে নিজের স্বভাব পরিবর্তন করার যুদ্ধে সর্বদা নিয়োজিত থাকা উত্তম এবাদত।
- আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পাঁচ দেয়ালের দুর্গে বাস করা শ্রেয়। যথা ঃ
  (১) নির্জন বাস, (২) নীরবতা অবলম্বন, (৩) ক্ষুধা যন্ত্রণা ভোগ,
  (৪) বিনিদ্র রাত্রিযাপন এবং (৫) আলাহ্র যিকিরে মশগুল থাকা।
- আলাহ্কে পাবার জন্য শেষ রক্ত বিন্দু নিয়ে প্রস্তুত থাকো তাঁর হুকুমে দান করার জন্য।
- শরীয়ত ও তরিকত একত্রে মিশিয়ে ডুব দিলে আলাহ্র প্রেমে নিমগ্ন থাকা যায়।
- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিথ্যাকে ধ্বংস এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হওয়ার জেহাদে রত থাকলে আত্মিক উন্নতি হবেই হবে।
- বিশ্বাসের সুবাস উড়ে গেলে বিশ্বাস হয়ে যায় বিষ।
- চরিত্রহীন আলেমের সংসর্গ হতে চরিত্রবান দুনিয়াদার লোকের সংসর্গ অনেক ভালো।
- যে ব্যক্তি মনে ও মুখে এক নয় তার এবাদত শুদ্ধ নয়।
- বিশ্বাস ঘাতকেরাই নিজ নিজ কামনায় ধরা পড়ে।
- আমিত্বের আবরণ দূর করার প্রচেষ্টার অপর নাম এবাদত।
- বার বার মৃত্যু, বার বার জন্ম; এতে আছে আনন্দ, কেউ জানে না মর্ম।
- 'না' দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করা যায়,'না' দিয়ে নতুন সৃষ্টি করা যায় যদি বোঝা যায় 'না' এর মর্মকথা।
- তারা ইসলামের আলোকে দেখিতে পায় নাই, যারা আলাহ্র জন্য লালায়িত নয়।
- যে অচল হয়ে পৃথিবীতে চলে তার কাছে অচল পয়সার দাম আছে।
- সরলে গরল মিশাইও না, গরলে সরল মিশাইও না।
- যার প্রেমের শুরুও নেই, শেষও নেই তার প্রেম কাঁচা।
- দরবারে এসো আশেকান হিসাবে, নারী-পুরুষ হিসাবে নয়।

....

শান্তির শ্রাবণ ধারা এসেছো ধরায়
পঙ্কিল জীবন হয়েছে পুত তোমার কৃপায়

সুবিশাল জগৎ সংসারে অনন্ত গতিময় জীবনের প্রবাহে সৃষ্টির বৈচিত্র্যময়তা রয়েছে অক্ষুন্ন। পৃথিবীও নিজস্ব নিয়মে অব্যাহত রেখেছে এই ধারা। এখানে জীবন আ.স জীবন যায়। ফেনায়িত সৃষ্টি-সাগরে সামান্য বুদবুদ সমান অস্তিত্ব নিয়ে প্রতিটি মানুষ আসে এবং যায়। তবু এই সাধারণ নিয়মটাকে ব্যতিক্রমে বিভাসিত করেন কেউ কেউ। তফাতটা শুধু অস্তিত্বের দীর্ঘস্থায়ীত্বের অর্থাৎ সময়ের। এর পেছনের মূল যে সত্য প্রধান ভূমিকা রাখে তা হচ্ছে 'কল্যাণ-ব্রত'। 'অন্যের জন্যে আমি' - এই কর্ম-সাধনায় তাঁরা অতিবাহিত করে যান সমগ্র জীবন। কল্যাণিত জীবন সমষ্টিই তাই ঋণী চেতনায় 'একক জীবন'-কে ধরে রাখে। আত্মশক্তিতে ও সত্যে তাঁরা অধিকার করে নেন অনুগত জীবনের উপাচার। 'একক জীবন'-কে ঘিরে বিচিত্র জীবনের যে সমাগম, তাদের কেউ সত্যকে, কেউবা শক্তিকে গ্রহণ করেন। স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা থাকলেও দু'য়ের কাছেই তিনি উপনীত হন মহাপ্রাণ-এ। দু'য়ের কাছেই তিনি হন স্তুতির 'রূপ'। রূপ থেকে রূপান্তরে যাত্রা তাই সেই সব 'মহাপাণ'-দেরকে ক্ষয়িষ্ণু সত্তায় নয় বরং ক্রমশ জীবন্ততর করে তোলে সময়ের অভিযাত্রায়। এই ধূলি-ধরা থেকে লোকান্তরিত এমনই এক মহাপাণ - "সুলতানুল আউলিয়া আলহাজ্ব হযরত শাহ্ কলন্দর সূফী খাজা আনোয়ারুল হক্ রওশন জমির মাদ্দা জিল্লাহুল আলী"। মানবতার মহান সাধক তিনি। তথাকথিত ধর্ম-ধারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে এক ভিন্ন ও মূল সত্যে প্রতিষ্ঠিত ধর্মবোধকে পুনরুজ্জীবিত করে তিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন মানুষেরই কল্যাণব্রতে।

বিরল ব্যক্তিগণ আগমনেই রেখে থাকেন আগামীর ইঙ্গিত। খুব সাধারণ ধারায় ঘটে না তাঁদের আগমন বা আবির্ভাব। স্থান-কাল-পাত্র বুঝেই তাঁরা অভিবাদন গহণ করেন পৃথিবীর, প্রকৃতির। জননী ও জনকের নিবিড় আকাঙ্খার সাত্ত্বিক প্রকাশ হয়ে তাঁদের প্রথম কান্না ধ্বনিত হয় জাগতিক বলয়ে। সূফী সাধক খাজা আনোয়ারুল হক্-ও আবির্ভূত হন এই ধারায় মা-বাবার বহু আকাঙ্খার বহু সাধনার ধন রূপে। তাঁর মায়ের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে সেই সত্য - "ওকে আমি মাজারে মাজারে ঘুরে পেয়েছিলাম।" তিনি ভূমিষ্ট হয়েছিলেন কলকাতার হ্যারিসন রোডে দুই তলা বাসার পশ্চিমের ঘরে। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৬ সালে। বাংলা সন হিসেবে ১৩৪৩-এর ১৭ অগহায়ণ, বুধবার সকাল ১১টায়। বাবা মজর উদ্দিন ভূঁইয়া ও মা ছায়েদা আখতার দীর্ঘদিন বিভিন্ন পীর-ফকির, মাজার-দরবার, দান-দক্ষিণার পর লাভ করেন তাঁকে। কিন্তু দুর্লভ এই সন্তান দুর্লভই হয়ে রইলেন জগতের বুকে।

অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতায় আবির্ভূত হয়ে তাঁর মন-মানসিকতাও শৈশব থেকে ছিল রাজসিক। রাজধানীর বিলাসপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা এই মহান সাধক পরিবারের সাথেই দেশ বিভাগের সময় চলে আসেন বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কিশোরগঞ্জে। পিতার পথ অনুসরণ করে তিনিও আয়ের উৎস হিসেবে বেছে নেন ব্যবসা। কিশোরগঞ্জ শহরেই ছিল তার কাপড়ের দোকান। স্বাধীনচেতা মানুষ মাত্রেই ব্যবসাকে অবলম্বণ করতে দেখা যায়। চাকরি করা মানেই অন্যের গোলামী করা - তিনি নিজেই তা বলতেন। আজীবন তিনি স্বাধীন জীবনযাপন করেছেন। আপন ভুবনে আপনিই বাদশাহী করেছেন।

সংসারের জটিল আবর্তে তিনি বাঁধা পড়ে থাকেননি। যদিও পারিবারিক ভাবেই তিনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন ষাট দশকে (সম্ভবত ১৯৫৫/৫৬ সালে)। দাম্পত্য জীবনে তিনি ছিলেন আদর্শ স্বামী। যোগ্য স্ত্রীর সংস্পর্শে তিনিও তাঁর সাধনার গতিপথকে ত্বরান্বিত করতে পেরেছেন। দু'জনার মধ্যে কখনও বিবাদের ছোট খাটো প্রকাশও পাওয়া যায়নি। সংসার উদাসীন তিনি অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন মাজার, দরবার ঘুরতেন। বিশাল সম্পত্তির মায়া ছিন্ন করে তিনি বাইরে বাইরে ঘুরতেন অন্তরে পোথিত সত্য সন্ধানী সত্তার উদ্বেলতায়। প্রচুর অর্থও নিজে দু'হাতে নিঃসঙ্কোচে ব্যয় করেছেন এ পথেই। অবশেষে তাঁর অনুসন্ধিৎস্যু মন খুঁজে পেলো তাঁর কাঙ্খিত আশ্রয়। আত্মবিকাশের সঠিক মাধ্যম। দর্শন পেলেন, সমর্পিত হলেন 'কান্দুলিয়ার মৌলভী' অর্থাৎ হযরত আবু আলী আক্তারউদ্দিন শাহ্ কলন্দর গউস পাক্ (রঃ)-এঁর চরণে। নিখাদ প্রেমের তরী ভাসালেন গউস পাক (রঃ)-এঁর হৃদয় সাগরে। কর্ম ও ত্যাগের সাধনায় তাঁর একনিষ্ঠতা তাঁকে মুক্তির সনদ এনে দিল। পরশ পাথরের পরশে 'ভাটির ছেড়া' (তাঁর হুজুর তাঁকে এ নামেই ডাকতেন) হলেন স্বতন্ত্র এক পরশ পাথর। সাধনার এই পর্যায়ে বৈশ্বিক মানবতার অনুধ্যান নিয়ে তিনি হলেন সংসার ত্যাগী। তবে পরিবারে তখন তাঁর মা, স্ত্রী, ছেলেরা বা ভাই-বোনদের কারো প্রতিই তিনি অবিচার করেননি। ব্যবসা-সম্পত্তি সব ছোট ভাই আজিজুল হক বাচ্চুর হাতে দিয়ে দেন। স্ত্রীকে পূর্ব থেকেই ইঙ্গিত দিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখেন। আর তাঁর মা তো জানতেনই যে - "ওর বয়স যখন এক বছর তখন এক হিন্দু সাধু ওকে দেখেখ বলেছিলেন, 'মা' তুই এ ছেলেকে কোন বন্ধন দিয়েই ধরে রাখতে পারবি না।" সাধনার সন্তান হারালো সাধনায়। তবে মাতৃভক্তি ছিল তাঁর চরম। ওনার যারা অনুসারী বা ওনার কাছে যারাই আসতেন তিনি তাঁদেরকে 'মা'-এর প্রতি অনুরক্ত হতে উপদেশ দিতেন। তিনি বারবারই বলতেন যে, মায়ের ঋণ কখনো শোধ করা যাবে না।

গউস পাক্ (রঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁকে খাঁটি পরশ পাথরে পরিণত করেছেন। সে সব অনেক ঘটনাই তিনি বলেছেন। যা 'বর্তমান সংলাপ' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে ইতোপূর্বে। অনেকেরই জানা আছে সে সব ঘটনা। জানা যায়, 'শাহ্ সূফী হওয়ার পর তিনি প্রথম অবস্থান করেন ছাতিরচরে। অতঃপর সেখান থেকে তিনি এলেন রাজধানী ঢাকার নারিন্দা ভুতের গলিতে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তিনি ধানমন্ডির বর্তমান ঠিকানায় অবস্থান নেন। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিলাস বহুল রাজধানীতে যাঁর জন্ম রাজধানীতেই তাঁর লোকান্তর। যদিও তফাৎটা এপার বাংলা - ওপার বাংলা। ঢাকার বিলাস বহুল ধানমন্ডিতে তিনি হাক্কানী খানকা শরীফ স্থাপন করে তাঁর মুর্শিদের হুকুমেই তিনি গড়ে তোলেন তাঁর রাজত্ব। কিন্তু শুধু ঢাকা কেন্দ্রিকই ছিল না তাঁর কর্মসাধনা, দেশ তথা উপমহাদেশ তথা সমগ্র এশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অঞ্চলে ছড়িয়েছেন তাঁর সাধনার দীপ্তি। গ্রামে-গঞ্জের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে মানবতার ধর্মকে প্রসারিত করে দিয়েছেন। ভাববাদী ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে তিনি ধর্মান্ধতাকে কখনোই প্রশ্রয় দেননি। তাঁর সংস্পর্শে যিনি এসেছেন তিনিই উপলব্ধি করতে পেরেছেন প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ। 'হাক্কানী' আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে সারা দেশব্যাপী তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে স্থাপন করেছেন হাক্কানী খানকা শরীফ, আস্তানা শরীফ, দরবার, হাক্কানী কমপ্লেক্স প্রভৃতি। তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হাক্কানী মিশন বাংলাদেশেরও প্রতিষ্ঠা সেই একই লক্ষ্যে তথা 'ধর্ম মানবতার জন্য, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয়'। হাক্কানী মিশন বিদ্যাপীঠ, হাক্কানী মিশন মহাবিদ্যালয় - তাঁর শিক্ষানুরাগিতাকেই প্রকাশিত করে। বর্তমান হলুদ সাংবাদিকতার জগতে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে নির্ভীক জেহাদের ডাক দিয়ে, সৃজনশীল ও আত্মিক সেবা সহায়তা দানের অভিপ্রায়ে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক বর্তমান সংলাপ' তাঁর যুগোপযোগী আধুনিক চিন্তা-চেতনাকেই প্রতিভাত করে। তাঁর আশীর্বাদে পুষ্ট হয়েই 'বর্তমান সংলাপ' দৈনিকের পথে পদার্পণ করবে একদিন। কেননা একাধিকবার তিনিই একথা বলেছেন।

ধর্মের গোঁড়ামিকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। 'সূফী সাধনার' উন্মুক্ত চিত্ত বলয়ে তাঁর পরিভ্রমণ। শুভ্র বসনে সজ্জিত হয়ে যে শাহানশাহীতে তিনি থাকতেন, তা কারো কারো কাছে প্রশ্নবোধক হয়ে দেখা দিতো। কিন্তু যিনি তাঁর সঙ্গ লাভ করেছেন তিনিই দেখেছেন বাহ্যিক আবরণের আড়ালে তাঁর ত্যাগের চরমতম নিদর্শন। ভক্তবৃন্দের উপহার, উপাচার তিনি কখনোই ব্যক্তি স্বার্থে কুক্ষিগত করেননি। বরং তিনি মর্জি মাফিক তা বিলিয়ে দিয়েছেন ভক্তবৃন্দের মাঝে। যে পুঁরুষ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের সাধনায় নিবেদিত, তাঁকে আর কী করে টানতে পারে জাগতিক সম্পত্তির মোহ? আত্মোন্নতির চরমতম পর্যায়ে উন্নিত হতে তিনি মজ্জুব অবস্থায়ও থেকেছেন। পথে পথে, নদীর ঘাটে নিজের সাধনায় একাগ্রচিত্তে মশগুল থাকতেন। খাওয়া-দাওয়া তুচ্ছ জ্ঞান করে 'এক আল্লাহ্‌র' ধ্যানে নিমগ্ন থেকেছেন তিনি। তাঁকে এক সপ্তাহ পর্যন্তও কোন কিছু না খেয়ে থাকতে দেখেছেন কেউ কেউ। ভক্তদের আনা বিচিত্র রকমের অভিজাত খাবার সামনে থাকলেও কখনই তিনি পেট ভরে তা খেয়েছেন বলে শোনা যায় না। খুব সামান্যই তিনি খেতেন। ঘুমের ক্ষেত্রেও তাঁর নিয়ন্ত্রণ পুরোমাত্রায়। তাঁর সাথে রাত জেগেছে এমন অনেককেই বলতে শোনা যায় তিনি আদৌ ঘুমাতেন না। অর্থাৎ নিজের প্রতি নিজের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাঁর পুরোপুরি। আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান যিনি তাঁর কাছে অন্য কোন বিরুদ্ধ শক্তিই কি প্রভাব ফেলতে পারে?

সফর প্রিয় ছিলেন তিনি। অধিকাংশ সময়ই তিনি সফরে সফরে থাকতেন। কখনো গাড়িতে, কখনো নৌকায়, কখনো পায়ে হেঁটে তিনি সফর করেছেন দেশের আনাচে-কানাচে। তাঁর প্রতিটি সফর ছিল কার্যকারণ সম্পর্কিত। ধর্মকে কর্মের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন - "নিজের বিচার নিজে কর রাত্রদিনে।" আত্মবিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় আত্মোন্নয়নের পথে অভিযাত্রী রূপে গড়ে উঠতে তিনি দীক্ষা দিয়েছেন তাঁর অনুসারীদেরকে। ভালবাসায়, স্নেহে, আদরে আপ্যায়নে, আতিথেয়তায় তাঁর তুলনা চলে না। অনেকেই তাঁর কাছে আসতেন এ সবেরই টানে। শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই নয়, জাগতিক কর্মানুশীলনের মাধ্যমেও তিনি অনেককেই দিয়েছেন নতুন জীবনের সন্ধান। তাঁর প্রতিটি কথায়, চলাফেরায়, ভঙ্গিমায়, চাহনিতে তিনি শিক্ষণীয় ইঙ্গিত রেখেছেন। যে যেভাবে বুঝেছে সে সেভাবেই তা গ্রহণ করেছে। দরবারী আদব ও তাঁর হুকুম যথাযথ পালন করতে পারলে অনেক মকসুদিই তার সমস্যার সমাধান করিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলেন বলেই ওলীকুল শিরোমনি হয়েও তিনি নিভৃতচারী জীবনযাপন করেছেন। 'মন চাইলে আইসেন' - সূত্রে তাই তিনি আগন্তুকদের আহবান জানাতেন। কখনই তিনি নিজের সুপ্ত সাধন-ভান্ডার যেচে কারোর সামনে প্রচার করেননি। কারণ তাঁর শিক্ষাই ছিল 'ধনবান হও, প্রকাশিত হয়ো না'। যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহের পাত্র শুধু তিনিই তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছেন।

২০ শ্রাবণ ১৪০৬, ৪ আগস্ট '৯৯ বুধবার সকাল ৭টা ৫ মিনিটে তিনি লোকান্তরিত হলেন। মা-ভক্ত সাধক-সন্তান মায়ের মৃত্যু তারিখকেই বরণ করে নিলেন নতুন পথে যাত্রার। পরিশেষে মায়ের পাশেই শায়িত হলেন তিনি। কিশোরগঞ্জ জেলার চান্দপুর গ্রাম আজ এই মহাপ্রাণের স্পর্শে পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে। কল্লোলিত হয়ে উঠেছে তাঁর প্রেমিক, ভক্ত ও মকসুদিদের সমাগমে। এক মহামিলন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে চান্দপুর। এর ব্যাপ্তি দিনে দিনে প্রসারিত হবেই। কেননা জাগতিক দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকা সূফী সাধক আনোয়ারুল হক্‌ আজ অন্তরালে থেকেই নিজেকে প্রকাশিত প্রসারিত করবেন বিশ্বাসীদের মাঝে। বিশ্বাসীদের কাছে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী এক মহাপ্রাণ, যিনি অবশ্যই প্রশংসার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আছেন, থাকবেন। ❑